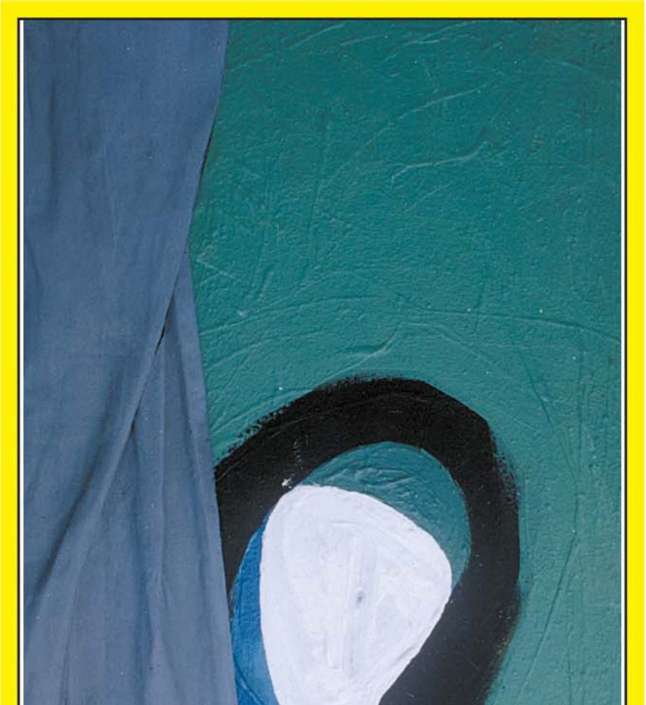


E-BOOK

গল্প

বিকেলবেলার গল্প

আনিসুল হক



ঢাকা শহরের রমনা পার্ক। সুন্দর রৌদ্রালোকিত বিকেল।

শৌখিন বয়স্ক এক ভদ্রমহিলা তাঁর তরুণী পরিচারিকা কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে ঢুকলেন। তাঁর নাম গুল নাহার। আর পরিচারিকার নাম কুসুম। তাঁরা হাঁটছেন। একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছ পর্যন্ত। বৃদ্ধা বক বক করেই চলেছেন।

কুসুম।

জি দাদি।

মোট কয় পাক হাঁটলাম মনে আছে?

তিন পাক... না না... চার পাক।

কুসুম! তুইও আমার মতো বুড়ি হয়েছিস? তুই কেন ভুলে যাস?

অঙ্কটা পারি না দাদি। বাকি সব মনে থাকে। লেখাপড়া বেশি শিখি নাই তো। মাস্টার বলত, কুসুম বেগম, তোমার অঙ্কের মাথা নাই।

অঙ্কের মাথা না থাক, উঁকুনভরা মাথাটা তো আছে।

মাথা আছে, উঁকুন নাই।

কিন্তু মনটা কি এখানে আছে?

এটা ক্যান জিগাইলেন দাদি।

ওইযে বাইরে গেটের দারোয়ানটা বার বার কাশি দিচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি তো তাই।

দাদি, বুড়া হইলেও আপনের কান ভালো আছে। দাদি, আপনের হাঁটা ইন কমপ্লিট। এখন বসেন।

ইন কমপ্লিট হলে বসব কেন?

ইন কম্পিলট হইলে বসবেন না? পুরা ৫ পাক হইছে তো।

কমপিল্ট হয়েছে বলতে চাস।

হ। ইন কমপিল্ট। মানে কমপিল্ট-এর মধ্যে। দাদি বুড়া হইছেন তো, ইংরাজি ভুইলা গেছেন। হি হি হি।

চড় খাবি।

দাদি, আপনের বেঞ্চিটাত আপনে একটু বসেন। জিরান। বয়স হইছে, রেস্ট না নিলে কখন কি হইয়া যায়, বুঝেনই তো...

দূরে গেটে দারোয়ান আবার কাশি দেয়। তাই শুনে গুল নাহার বলেন, বুঝলাম, তোর কৃষ্ণ বাঁশি বাজায় না, কাশি দেয়। কাল দুটো স্ট্রেপসিলস কিনে এনে তোর দারোয়ানকে দিস।

তোর দারোয়ান? দারোয়ান আমার না। পার্কের।

গুল নাহার একটা বেঞ্চে বসে পড়েন। কুসুম হাঁটা ধরে। দারোয়ানের কাশির আওয়াজ শুনলে সে স্থির থাকতে পারে না।

এই কুসুম। চিপসের প্যাকেটটা দিয়ে যা। গুল নাহার গলা চড়িয়ে বলেন।

চিপসের প্যাকেট কুসুমের বাঁ হাতে। সে খুঁজে পায় না।

বলে, দাদি চিপসের প্যাকেট তো আপনাক দিলাম।

গুল নাহার বলেন, দিলে আমি কী করলাম।

কুসুম বলে, ব্যাগে ভরছেন নাকি?

তোর বাঁ হাতে ওটা কী?

আরে আমার কপাল। বাম হাতে জিনিস থাকলে টেরই পাই না।

মনটা তো উড়ু উড়ু, টের পাবি কী করে? চিপসটা দিয়ে তুই চোখের সামনে থেকে দূর হ।

কুসুম চিপসের প্যাকেট দেয় গুল নাহারের হাতে। তারপর দ্রুত পায়ে এগুতে থাকে গেটের দিকে।

এই কুসুম। বেশি দূরে যাস না। ডাকলে যেন শুনতে পাস। গুল নাহার আবার গলা চড়ান।

আচ্ছা–বলে কুসুম অদৃশ্য হয়ে যায়।

গুল নাহার চিপসের প্যাকেট খুলে আকাশে ছুড়তে থাকেন। কাক আসতে থাকে একের পর এক। গুল নাহার কাকদের সাথে কথা বলেন, আয় আয়, কী ব্যাপার ভয় পাচ্ছিস কেন? লেজকাটাটাকে তো কোথাও দেখছি না। আর ধূসর গলারটাই বা কই গেল। ওই যে... মনে হয় আমার কথা বুঝেছে...

২.

পার্কের গেট দিয়ে ঢুকলেন একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ, তাঁর নাম হায়দার আলী। তাঁর সঙ্গে একজন গৃহপরিচারক। কাশেম।

হায়দার আলীর পরনে সাদা টি শার্ট, সাদা ট্রাউজার, সাদা কেডস। তিনি হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, এক নাগাড়ে এতক্ষণ হাঁটাটা ঠিক হবে না। একটা বসার জায়গা দরকার।

কাশেম বলে, এদিকে তো কোনো বেঞ্চ দেখি না। ওদিকে একটা দেখা যায়। তিনজন ফকির বসে আছে। ওই বেঞ্চটার এক কোণে বসে পড়বেন নাকি।

তোমার আর বুদ্ধিশুদ্ধি কখনও হবে না। ওই ফকির মিসকিনদের সাথে আমি গিয়ে বসি। আর যত লোক ওদিক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবে, তারা আমাকে একটা করে টাকা ভিক্ষা দিয়ে যাক।

ছার যে একখান কথা বললেন, কে আমীর কে ফকির চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

গায়ে লেখা থাকে নাকি কে ফকির কে না।

ছার আপনে আর আমি যে এক সাথে হাঁটতেছি, লোকে বুঝতেছে না কে মনিব আর কে কর্মচারী।

তা হলেও আমি ওই ফকিরদের বেঞ্চে গিয়ে বসতে পারি না।

তা পারেন না। অবশ্যই পারেন না। তাইলে ছার চলেন ওই বয়স্ক মহিলার কাছে গিয়েই বসি।

বয়স্ক মহিলাদের অসুবিধা কী জানো, গল্প করতে শুরু করবে। বেশি কথা বলা লোকদের সহ্য করা যায় বলো।

আপনে স্যার মনিব মানুষ। আপনি ক্যান সহ্য করবেন। তয় আমি স্যার চাকরি করে খাই, আমারে সহ্য করনই লাগে।

কী বলতে চাও তুমি?

স্যার আশপাশে যখন অন্য কোনো বসার জায়গা নাই তখন আর কী করবেন? ওই মহিলার ওদিকেই চলেন।

চলো। দেখো বাপু কথা বেশি বললে কিন্তু আমি ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

৩.

হায়দার আর তার পরিচারক গুল নাহারের বেঞ্চের কাছে এলেন। কাকগুলো সব উড়ে গেল।

গুল নাহার আর্তনাদ করে উঠলেন। এই রে এ তো দেখি সর্বনাশ করল।

হায়দার বললেন, আপনি আমাকে বলছেন।

গুল নাহার বললেন, আর কাকে বলব?

কী যেন বলছিলেন?

আপনি আমার কাকগুলো উড়িয়ে দিলেন কেন?

কাকগুলো যে আপনার তাতো জানা ছিল না।

আমি তো ওদের খাওয়াচ্ছিলাম। ওরা আমার কত কাছে এসে খাচ্ছিল।

তাতে কি কাকগুলো আপনার হয়ে যায়।

কাকগুলো আমার আমি তা বলতে চাইনি, বলতে চেয়েছি আপনি কেন কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিলেন।

আমি তো তাড়াই নি। এটা সরকারি পার্ক। আমি চলার পথে চলছি। আমি তো আপনার বাড়ি গিয়ে ছাদের কাক তাড়িয়ে দেই নি।

এরপর আবার বলবেন না তো, এটা সরকারি পার্ক, কাজেই এ বেঞ্চে আপনি বসতে পারেন।

না তা বলব কেন? বেশি কথা বলা লোক আমার পছন্দ নয়... এই কাশেম, চলো, ওই যে একটা বেঞ্চ খালি হয়েছে, ওটায় গিয়ে বসি।

কাশেম বলে, জি ছার তাই চলেন।

তারা দুজন, হায়দার আর তার পরিচারক আরেকটা বেঞ্চের দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

গুল নাহার বকবক করেই চলেছে, কী যে এক খিটমিটে বুড়ো। বয়স হলে যে মানুষের কী হয়, খিটমিট খিটমিট করতে থাকে।

৪.

দূরে একটা বেঞ্চের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে হায়দার তার পরিচারক, কিন্তু তারা পৌছার আগেই সেটা দখল করে ফেলল এক জোড়া তরুণ-তরুণী। বৃদ্ধ হায়দার আলী সেখানে যখন পৌছলেন, তখন তরুণ-তরুণীদ্বয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

হায়দার আলী সেখানে পৌছে লজ্জা পেলেন। কিন্তু দম নেবার জন্যে তাকে কিছুক্ষণের দাঁড়াতে হলো।

তরুণী বলে উঠল, আজকালকার বুড়ারা দেখছি বেশি বেহায়া হয়। আমরা

দুইজন ইয়ং ছেলেমেয়ে বসে আছি, আর দেখো দেখো বুড়া কীভাবে ছুটে এল।

ওদিকে গুল নাহার তাকিয়ে দেখলেন হায়দার আলী বসার জায়গা পেলেন না।

গুল নাহার বললেন, খুব খুশি হয়েছি, বুড়ো ওখানেও জায়গা পেল না। আহারে বেচারা, ওই বেঞ্চটাও বেদখল হয়ে গেল। বোঝো এখন মজা।

এদিকে তরুণটি বলছে তরুণীটির গায়ে হেলে পড়ে, মনে হয় তোমারে পছন্দ হইছে... তারা দুজনেই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

হায়দার তখন গলা চড়িয়ে তরুণ-তরুণীকে শুনিয়ে বলেন, কাশেম ফাঁকা একটা বেঞ্চ পেয়ে এদিকে ছুটে এলাম, আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো আর আমাদের সময়ের মতো ভদ্র না যে সিনিয়রদের চেয়ার ছেড়ে দেবে, চল অন্য দিকে যাই।

তরুণীটিও শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, এই সিনিয়র ভদ্রলোকের জন্যে ওখানে একজন সিনিয়র ভদ্রমহিলা বসেই আছেন, উনি ওখানে গেলেই তো পারেন। কী যে আক্কেল বুঝি না...

হায়দার আলী আবার মহিলার বেঞ্চের দিকেই রওনা হলেন।

৫.

গুল নাহার দেখলেন হায়দার আলী এদিকেই আসছেন।

তিনি বক বক শুরু করলেন, বুড়ো তো দেখি এদিকেই আসছে। পা দিয়ে কেমন ধুলো ওড়াচ্ছে... মনে হচ্ছে পায়ে খুর আছে। গোধূলিতে ধূলি ওড়াচ্ছে। আজ আমার কাকদের খাওয়ানো হলো না। এই বুড়ো আমার বিকালটার বারোটা বাজাল।

হায়দার আলী আর তার পরিচারক কাছে এসে গেছেন।

হায়দার আলী বকে চলেছেন, কাশেম, বেঞ্চটাতে দুই ছেলেমেয়ে বসে পড়ল। ওদের কাছে বসা তো ঠিক হবে না, কী বলো।

কাশেম বলল, না ছার ঠিক হবে না। ওরা ভাববে বুড়া বড়ো বেহায়া।

হায়দার বললেন, ওদিকে ফকিরগুলোনের বেঞ্চেও তো বসা যায় না।

না।

তা হলে এ সিটটাতেই বসে পড়ি।

এ ছাড়া আর উপায় নাই ছার।

হায়দার আলী গুল নাহারের বেঞ্চের এক পাশে বসে পড়েন।

হায়দার গুল নাহারের উদ্দেশে বলেন, আসসালামো আলায়কুম...

গুল নাহার বলেন, আপনি আবার এখানে? বসে পড়লেন? কী মুশকিল?

হায়দার বলেন, আমি আপনাকে সালাম দিয়েছি।

গুল নাহার বলেন, তার জবাবেই আমি আপনাকে এ কথা বলছি...

সালামের জবাবে বলতে হয় ওয়ালাইকুম আস্সালাম। সেটা বলাই আপনার উচিত ছিল।

আর আপনার উচিত ছিল এখানে বসার আগে আমার পারমিশন নেওয়া।

বেঞ্চটা আপনার নয়। সরকারি পার্কের।

পায়ের জুতোর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, ইস। কী রকম ধুলো। এরা যে কেন রোজ পানি ছিটায় না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে জুতা মুছতে থাকে।

আপনি কি রুমাল দিয়ে জুতা বুরুশ করেন।

কেন নয়?

আর জুতার ব্রাশ দিয়ে কী করেন, দাঁত মাজেন?

আপনি আপনার নিজের চরকায় তেল দিলে ভালো করবেন। আমি কী করি না করি তা আপনাকে দেখতে কে বলেছে।

ও মা আপনি আমার বেঞ্চে এসে বসে যদি উদ্ভট কাজ করতে থাকেন আমার নজরে পড়বে না।

পড়বে, কিন্তু তা নিয়ে কথা বলাটা কি উচিত?

আমি আবার যা ভাবি তা বলে ফেলি।

তা হলে তো মুশকিল। বকবক করা লোক আবার তেমন পছন্দ নয়। কাশেম, বইটা দাও তো।

কাশেম ঝোলা থেকে একটা বই বের করে দিল। শেষের কবিতা।

হায়দার আলী তার রিডিং গ্লাস বের করলেন। সেটা একটা দেখবার জিনিস বটে। মনে হচ্ছে তিনি টেলিস্কোপ বের করছেন।

এটা কি বের করলেন? চশমা। আমি ভাবলাম টেলিস্কোপ নয় তো মাইক্রোস্কোপ।

সে আপনার দেখবার ভুল। চোখের ডাক্তারকে চোখদুটো আরেকবার দেখান। মনে হয় একেবারেই গেছে।

সেই। কে কাকে বলছে... চালনি বলে সুই...বাকিটা আর বললাম না...যার বই পড়ার জন্যে টেলিস্কোপ লাগে, সে আবার উপদেশ দেয় অন্যকে

আমার চোখ খারাপ? হা হা হা... এখনও আমি সুইয়ের মধ্যে সুতা ঢুকাতে পারি।

কী পারাটাই না পারেন। থাক আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না...

সেই ভালো। আমাকে একটু মন দিয়ে পড়তে দেন...

পড়েন। মন দিয়ে পড়েন, কি প্রাণ দিয়ে পড়েন, আমার কী?

হায়দার শেষের কবিতা বের করে পড়তে থাকেন। দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর, ভালোবাসিবারে দে মোরে অবসর।

গুল নাহার বলেন, আমাকে বলছেন?

হায়দার বলেন, যদি বলি হ্যাঁ।

অভদ্রতা হচ্ছে। ভদ্রমহিলাকে কেউ তুই তোকারি করে না।

যদি বলি না।

তা হলে *শেষের কবিতা* পড়ছেন।

ঠিক তাই।

ইস আমার খুব প্রিয় বই। এক সময় মুখস্থ ছিল।

হে হে হে হে হে।

হাসছেন কেন?

এক সময় মুখস্থ ছিল, এ কথা বলা খুব সোজা। সবাই বলত পারে। এখন মুখস্থ আছে বললে না হয় মিলিয়ে দেখা যেত।

আপনার কি ধারণা আমি বানিয়ে কথা বলছি...

না মানে ওই একই কথা আর কী...এসব বিষয়ে মিথ্যা বলাটা অন্যায় নয়।

কী? আপনি ভাবছেন আমি মিথ্যা বলছি... নেন বের করুন প্রথম পৃষ্ঠা...

করলাম।

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী রয় ও রে রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যার হল বৃদ্ধি। এই কারণে নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল অমিট রায়ে।

আপনি তো আশ্চর্য মহিলা। জিন ভূত কিছু আছে নাকি সাথে।

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি আমরা দুজন চলতি হাওয়া পন্থী

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল

পরান ছড়ায়ে আবীর গুলাল

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে

দিগঙ্গনার নৃত্য

তারা দুজনে একসঙ্গে বলে ওঠেন, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত

হায়দার আবেগ-আপ্লুত স্বরে বলেন, আমাদের ভাব হয়ে গেল, শেষের কবিতা আমাদের ভাব করে দিল। আমি সত্যি আপনার স্মরণশক্তির প্রশংসা না করে পারছি না।

গুল বলেন, প্রতিটা লাইন আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে।

আমিও না খুব কবিতা ভালোবাসি।

তাই নাকি?

ছোটবেলায় বিক্রমপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলাম কিনা!

আপনি বিক্রমপুরে ছিলেন?

তা ছিলাম বৈকি। আমার নানাবাড়িতে। ছ' বছর বয়স থেকে কলেজ পর্যন্ত।

সেসব দিনের কথা আপনার মনে আছে?

কিছু কিছু। বুড়ো হয়ে গেছি। কত স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে। (চোখ ছলছল)

ছোটবেলার স্মৃতি মানুষের জীবনের খুব বড় সম্পদ। কী বলেন?

জি... শৈশবের স্মৃতি... যৌবনের স্মৃতি...

আপনার মনে পড়ে?

হ্যাঁ কী সুন্দর নদী ছিল... নদীর ধারে ছিল এক জমিদারের কোঠা বাড়ি... শান্তিমহল

শান্তিমহল?

আপনি চেনেন নাকি?

নদীর ধারে ছিল একটা দোতলা বাড়ি। চারদিকে নারকেল বাগান... তার নাম তবে শান্তিমহল ছিল...

হ্যাঁ শান্তিমহল। আর সেই বাড়িতে বাস করত... যতদূর মনে পড়ছে...পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী মেয়েটি...

গুল নাহার বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী মেয়ে? কী নাম তার?

হায়দার বলেন, তার নাম... নামটা যেন কী... ফুল ফুল... না গুল... গুল নাহার

গুল নাহার?

কী হলো? চমকে উঠলেন বলে মনে হচ্ছে?

না মানে আপনি আমার ছোটবেলার সবচেয়ে ভালো বন্ধুটার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

কী আশ্চর্য!

তাকে লোকে ডাকত ধলা পরী বলে।

ধলা পরী। ধলা পরী। ঠিক এই শব্দটাই আমার মনে পড়ছিল না। এখন পড়ছে। সে তবে আপনার বন্ধু ছিল।

হ্যাঁ। আমরা এক স্কুলে পড়তাম।

গুল নাহার। ধলা পরী। সে ছিল পরীর মতো সুন্দর। তার গায়ের রং ছিল স্বর্ণচাপার মতো উজ্জ্বল সোনালী। তার চুল ছিল...একেবারে গল্পের কেশবতী কন্যার মতো লম্বা, ঝলমলে,

আরে এখনকার বিশ্বসুন্দরীরা যদি তাকে একবার দেখতে পেত, লজ্জায় মাথা নিচু করত। পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে রূপ নিয়ে চলে গেছে দূরে...

আহা আমার সে বন্ধুটি... আপনি জানেন শেষ পর্যন্ত সে কোথায় গেল... কী হলো তার?

কী হলো?

তার জীবনের একটা করুণ গল্প আছে। প্রেমকাহিনী।

বড় দুঃখের সে গল্প।

আপনি জানেন?

আসলে গুল নাহারের সঙ্গে এফেয়ার হয়েছিল যার, সে তো আমার খালাত ভাই। হায়দার আলী।

হ্যাঁ হ্যাঁ হায়দার আলী। আমার বন্ধু গুল নাহার এই নামই আমাকে বলেছিল বটে।

হ্যাঁ সে আমার খালাত ভাই...

আমার বন্ধু গুল নাহার আমাকে এক চিঠিতে তার জীবনের কাহিনী বলেছিল। একেবারে রোমান্টিক লাভ স্টোরি...

আমার বন্ধু শান্তি মহলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত সকালে। আর জুড়িগাড়িতে চড়ে তার লাভার হায়দার আলী যেত বাড়ির সামনে দিয়ে। গুল নাহার দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে, এমন সুপুরুষ যুবক রোজ যায় কোথায়?

আর হায়দার আলীর চোখ পড়ত দোতলায়, বারান্দায়। সে চমকে উঠত। এত সুন্দর মেয়ে এ বাড়িতে কোথা থেকে এল। সে কি পরীদের মেয়ে নাকি? সে তাকিয়ে থাকত।

গুল নাহারও তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাত।

হায়দারও।

গুল নাহার হাসত।

হায়দার আলীর বুক ছিদ্র হয়ে যেত। প্রত্যুত্তরে সেও হাসত। তার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যেত।

বিকেলবেলা হায়দার আলী ফিরত একই পথ দিয়ে। যখন গুলবদনের বারান্দায় এসে পড়ত বাবলা গাছের ছায়াটা তখন থেকেই শুরু হত গুলবদনের বুকের কাঁপন। এই তো ফেরার সময় হচ্ছে জুড়িগাড়িতে চড়া সে যুবকের।

আর হায়দার সারাটি দুপুর অপেক্ষা করত কখন বিকাল হবে। শান্তি মহলের সামনে দিয়ে সে যেতে পারবে। যতই সে কাছে আসে বাড়ির, ততই তার বুক কাঁপে। ততই তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে থাকে।

বিকালে হলুদ আলোয় ফুলে ঢাকা পথ। তার দিকে তাকিয়ে আছে গুল নাহার। সে কি আজ আসবে না। গাড়ির শব্দ আসে। তার শরীর জমে যেতে চায়। ওই তো সে আসছে...

ওই তো সে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। বিকেলের হলুদ আলো পড়েছে তার চোখেমুখে। কনে দেখা হলুদ আলো। সে কি মানুষ নাকি অপ্সরা।

সে চলে যায়। চাকার দাগ রয়ে যায় পথে? সেকি জানে সে দাগ রেখে যায় গুল নাহারের মনেপ্রাণে? মানে আমার বন্ধু লিখেছিল আর কী! অনেকবার পড়েছি তো চিঠিটা, মুখস্থ হয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে হায়দার এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাল। এক গোছা স্বর্ণচাপা সে ছুড়ে দিল দোতালার বারান্দায়।

ফুল পেয়ে গুলনাহার যেন স্বর্গ পেয়ে গেল হাতের মুঠোয়। কী করবে সে? মনে হয় সে আকাশে উড়ে যাবে, মিশে যাবে মেঘে মেঘে।

আর হায়দার আলী সে বিকালে ফিরছে ভয়ে ভয়ে। কী প্রতিক্রিয়া হবে মেয়েটির? সে যদি আর না আসে? হায় তার মুখ যদি আর কোনোদিন দেখা না হয়। কেন সে করতে গেলো এ কর্ম। এই তো ভালো ছিল রোজ দুবেলা তাকে একটুখানি দেখতে পাওয়া।

আর মেয়েটি অপেক্ষা করে কখন বিকাল আসবে। বাবলা ডালের ছায়া পড়বে বারান্দায়।

ছেলেটি ফেরে বিকালবেলা। আর কী আশ্চর্য বারান্দা থেকে এক গোছা ফুল এসে পড়ে তার গাড়িতে। ছেলেটা যেন সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ হয়ে যায় রোদ হয়ে যায়...

পরদিন ছেলেটা ফুলের তোড়ার সাথে ছুড়ে দেয় একটা চিঠি। কী যে আবেগে ভরা একটা চিঠি ছিল সেটা। আমার বন্ধু গুল নাহার বলেছিল...

আর বিকেল বেলা ফেরার সময় বারান্দা থেকে ফুলের তোড়া এল গাড়িতে। আর সাথে চিঠির ছোট্ট একটা জবাব। তাতে লেখা ছিল...আমিও

মানে বুঝলেন? হায়দার লিখেছিল একশ বার... আমি তোমাকে ভালোবাসি... তার জবাব গুল দিয়েছিল একটা মাত্র শব্দে... আমিও... আমার খালাত ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছিলাম আর কী!

সেই একটা শব্দ ছিল এক লক্ষ শব্দের চেয়েও মধুর এটম বোমার চেয়েও শক্তিশালী!

গুল বলেন, তারপর তারা দুজন ভালোবেসে ফেলল দুজনকে, গভীরভাবে।

হায়দার বলেন, রোজ আমার খালাত ভাই হায়দার যায় ওই পথ দিয়ে আর ছুড়ে যায় একটা চিঠি।

রোজ সকালে গুল নাহার পায় একটা চিঠি, তার উত্তর লেখে সারাদিন ধরে। বিকালে ছেলেটা যখন ফেরে, গুল উত্তর ছুড়ে মারে নিচের গাড়িতে।

কেবল চিঠিতে মনের কথা নয়, তারা অস্থির হয়ে ওঠে সামনাসামনি কথা বলার জন্যে।

পাশাপাশি বসার জন্যে।

ছেলেটা লেখে মেয়েটাকে নদীর ধারে আসতে।

নির্দিষ্ট দিনে মেয়েটা রওনা হয় নদীর ধারে বটগাছের নিচে।

তাদের দেখা হয়। কথা হয়।

কিন্তু গুলের আব্বা তার বিয়ে ঠিক করে এক উকিলের সাথে।

সে উকিল হলেও আসলে ছিল এক গুণ্ডা। সাথে তার সব সময় থাকত একটা দোনলা বন্দুক।

উকিল একদিন দেখে ফেলে গুল আর হায়দারকে নদীর ধারে। হায়দারের সাথে তার ঝগড়া হয়।

হায়দারকে সে তিনদিন সময় দেয় শহর ছাড়ার।

আপনি দেখি সবই জানেন।

গুল আমার বন্ধু ছিল। সে সব কথা আমাকে লিখে জানিয়েছিল। কিন্তু আপনি এত জানেন কী করে?

হায়দার আমার চাচাত...স্যরি... খালাত ভাই কিনা... আমাকে সে সবই খুলে বলেছিল যে...

গুল নাহার মনে মনে বলেন, আমার মনে হয় এই লোকটাই হায়দার...

হায়দারও বিড়বিড় করেন, আমার মনে হয় এই মহিলাই গুল... তবে আমাকে ধরতে পারেনি। তারপর মুখ খুলে বলেন, কী ভাবছেন?

আচ্ছা হায়দার সাহেব আর আসেন নি কেন বলতে পারেন?

আসে নি... তার আসার কথা ছিল নাকি?

হ্যাঁ... সেই ঘটনার পর সে আর কোনোদিনও গুলের সাথে যোগাযোগ করেনি... কিন্তু করাটাই কি স্বাভাবিক ছিল না....

ও হ্যাঁ মনে পড়েছে আমার খালাত ভাই এরপর তো আমার বাসাতেই এসে লুকিয়েছিল... কারণ ওই উকিল তাকে হত্যা করার জন্যে গুণ্ডা লাগিয়েছিল... তারপর সে অনেক চিঠি লিখেছে তার প্রিয় গুলের নামে... কিন্তু কোনো উত্তর পায়নি... সে জানতেও পারে নি গুলকে ওরা মেরে ফেলেছে নাকি অন্য কোথাও

সরিয়ে রেখেছে... গুলের খোঁজ না পেয়ে সে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল...

গুল নাহার বিড়বিড় করেন, কী চমৎকার মিথ্যেই না বলে লোকটা...

হায়দার বলেন, তারপর হায়দার চলে গেলো ঢাকায়... ঢাকায় তখন চলছে স্বাধিকার আন্দোলন... সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে আন্দোলনে... একদিন ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে সে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল... পুলিশ গুলি চালাল... গুলি এসে লাগল... আমার... স্যরি হায়দারের বুকে...সে ঢলে পড়ল রাজপথে... মরার আগে সে মাত্র একটা শব্দই উচ্চারণ করছিল... গুল... গুল নাহার...

গুল নাহার মনে মনে বলেন,এই মিথ্যের মধ্যে আবার স্বাধিকার আন্দোলন আনার কী দরকার ছিল...

হায়দার বলেন, ভেবে দেখুন দেশের জন্যে মৃত্যু, কী মহৎ ব্যাপার... আমি যদি এমনি বীরের মতো মরতে পারতাম...

গুল নাহার বলেন, আহা আপনার ভাই এভাবে মারা গেল... আপানাদের ফ্যামিলির ওপর দিয়ে নিশ্চয় খুব দুর্যোগ গিয়েছিল...

হায়দার বলেন, তা আর বলবেন না... দুর্যোগ মানে দুর্যোগ... খালা তো খুবই কান্নাকাটি করতেন আর পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা লাগল আমাদের ফ্যামিলির পেছনে...আমাকেও অনেক দিন ফলো করেছে...

আমরা যখন ভাইয়ের শোকে কাঁদছি, তখন গুল নাহার কিন্তু আছে খুবই আরামে... আনন্দে... সেই উকিল সাহেবকে বিয়ে করে পাড়ি দিয়েছে ঢাকার পথে...

গুল নাহার বলেন, কক্‌খনো না। আমার বন্ধু সে রকম মেয়ে না। নিজের ভালোবাসার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সে করতেই পারে না।

হায়দার বলেন, তার বাকি জীবন কেমন করে কাটল আপনি জানেন?

গুল নাহার বলেন, আমার বন্ধু গুল নাহার তার প্রিয় মানুষটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল দিনের পর দিন। মাসের পরে মাস। কিন্তু হায়দার সাহেবের আর দেখা নাই। অন্তত এক লাইনের একটা চিঠি যদি আসত। না তাও এল না। হায়দারের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে গুল নাহার শুকিয়ে কাঠ লেগে গেল... সে ঠিকমতো খায় না, দায় না, সারাক্ষণ শুধু কাঁদে... আর কাঁদে...

হায়দার মনে মনে বলেন, ভালোই তো গল্প বানাতে পারে... একেবারে নিখুঁত হচ্ছে চাপাবাজি... তারপর...

গুল নাহার বলেন, তারপর একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে সে গেল নদীর ধারে... যেন নদী ডাকছে তাকে... যেন নদী বলছে এসো এখানে এলেই পাবে তোমার হায়দারকে... গুল এক পা এক পা করে যাচ্ছে নদীর ধারে... কী ধূ ধূ করছে নদীর ধার... বালি আর বালি সে একেবারে পৌঁছল জলের ধারে... ভেজা বালির গায়ে সে লিখল চার অক্ষরের একটা শব্দ... হায়দার... তারপর ধীরে ধীরে সে নেমে গেল পানির গভীরে...আর কোনোদিন সে ফিরে আসে নি...

হায়দার বলেন, হায় আল্লা... এ কী শোনালেন আপনি... তারপর নিজেকে শুনিয়ে নিজে বলেন, এ যে সিনেমার কাহিনী হয়ে গেল। এতটা বানিয়ে কেউ বলে!

গুল নাহার বলেন, আজো যদি আপনি যান আড়িয়ল খাঁ নদীর ধারে এখনও একজন দুজন জেলে আছে যারা এ গল্প বলতে পারবে আর তারা কী বলে জানেন... বালির গায়ে বহুদিন হায়দার লেখাটা ছিল... স্রোত সেটা মুছে দেয় নি বহুদিন

গুল নাহার নিজের বানিয়ে বলার প্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ: কেমন বানালাম... নিজের মৃত্যুর বর্ণনা আমার চেয়ে আর কে সুন্দর করে দিতে পারবে?

হায়দারও নিজেকে বলছেন, এমনি কি আর নাম হয়েছে গুল। আমার চেয়ে অনেক বড় গুল ছাড়তে পারে...

প্রকাশ্যে বলেন, হায়... হায় কী শোনালেন আপনি আমাকে... হায় হায়...

গুল নাহার বিড়বিড় করেন, এমনি কী আর নাম হয়েছে হায়দার... আমার চেয়েও সে অনেক ভালো হায় হায় করতে পারে...। অবশ্য প্রকাশ্যে বলেন, বেচারি গুল নাহার...

হায়দার বলেন, বেচারা হায়দার...

গুল নাহারের স্বগতোক্তি: আমি কিন্তু বলতে যাচ্ছি না আসল কথা। ও চলে যাওয়ার একমাসের মাথাতেই আমার বিয়ে হয়ে গেল ওই উকিলের সাথেই...

হায়দারের আত্মকথন: ঢাকায় এসে যে আমি প্রেমে পড়ে গেলাম নায়লার, মানে আমার ছোটফুপুর মেয়ের, তারপর ফুপা জোর করে ধরে আমাকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিল আমিও রাজি হয়ে গেলাম বার বার সটকে পড়াটা উন্নত চরিত্রের লক্ষণ নয় বলেই... তা ছাড়া যৌতুকও তো খারাপ পাই নি...

গুল নাহার বলেন হায়দারকে, দেখেন একেই বুঝি বলে নিয়তির পরিহাস... সেই। সবই কপাল।

নিয়তির কী পরিহাস দেখেন আমরা দুজন এমনভাবে গল্প করছি যেন আমরা কত দিনের পরিচিত। আর আমরা গল্প করছি কী নিয়ে? আমাদের ছাত্রজীবনের দুই বন্ধুর জীবনকাহিনী নিয়ে।

প্রেমকাহিনী নিয়ে।

আর সে কাহিনী কত্তো করুণ।

হ্যাঁ আজকালকার ছেলেমেয়েরা হলে কিন্তু এমন ট্রাজেডি ঘটতেই দিত না। ঠিকই মেয়েটা আরেকটা বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করত।

ছেলেটা ঠিকই একটা বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে দেখে মহা ধুমধাম করে বিয়ে করে বলত, তুমিই আমার প্রথম আর তুমিই আমার শেষ।

হায়দার বিড়বিড় করেন, হায় হায় এই মহিলা তো দেখছি আমার বাসর রাতের প্রথম ডায়লগটাও জানে। জানল কী করে? নায়লা আবার সব বলে দেয় নি তো?

তিনি গুল বদনকে বলেন, আমরা কতক্ষণ ধরে গল্প করছি, যেন আমাদের কত মিল অথচ দেখেন আমাদের আজকের পরিচয়টা শুরু হয়েছিল ঝগড়া দিয়ে। অবশ্য আমি তেমন খিটমিট করিনি যতটা আপনি করেছিলেন।

গুল নাহার বলেন, আপনি আমার কাকদের তাড়িয়ে দেবেন আর আমি আপনাকে কিছুই বলব না, না?

আসলে আমার উচিত হয়নি আপনার কাকদের তাড়িয়ে দেওয়া।

ঠিক। একদম উচিত হয়নি। শোনেন, আপনি কি আগামীকাল বিকালে আসবেন?

হ্যাঁ। যদি ঝড়বৃষ্টি না হয়। আপনি?

আমাকে তো আসতেই হবে। কাকগুলো রোজ বিকালে আমার জন্যে অপেক্ষা করে যে। আপনি আবার কাল এসে আমার কাকগুলোকে তাড়িয়ে দেবেন না যেন!

আরে না। দেখবেন আমি কাল কাকের জন্যে খাবার নিয়ে আসব।

সে খুব ভালো ব্যাপার হবে। দেখবেন কাকদের মতো কৃতজ্ঞ প্রাণী আর

দ্বিতীয়টা নাই।

এ কথা বলছেন কেন? আপনার হাজব্যান্ড ছেলেমেয়ে নাতি সবাই নিশ্চয় খুব ভালো... কেয়ারিং...

আমার সাহেব যদি কেয়ারিংই হবে তাহলে কি আর আমাকে ফেলে আগেভাগে চলে যায়... তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

স্যরি আপনাকে দুঃখ দিলাম। তবে কথা কি জানেন আমারও তো একই অবস্থা। আজ থেকে ৮ বছর আগে সে গত হয়েছে। একা একা থাকি। দুই ছেলে আমেরিকা।

আমিও বলতে গেলে একাই থাকি। মেয়ের বাড়িতে। মেয়ে-জামাই দুজনেই চাকরি করে। নাতিটা ক্যাডেট কলেজে। সারাদিন আমি একা... সন্ধ্যা হয়ে আসছে। উঠতে হয়।

হ্যাঁ আমাকেও ফিরতে হবে...

কুসুম.... কুসুম....

কাশেম... কাশেম...

আমার মেয়েটা যে কোথায় যায় না, পার্কের গার্ডের সাথে গল্প না করতে পারলে তার পেটের ভাত হজম হয় না।

আর আমার কাশেম মিয়া যে কোথায় গেল...

কুসুম কুসুম

কাশেম কাশেম...

কাশেম আসে। তার হাতে একগোছা ফুল।

হায়দার বলেন, কী ব্যাপার কাশেম, কোথায় ছিলে?

কাশেম বলে, এই তো গেটের কাছে...

গুল নাহার বলেন, কাশেম মিয়া তুমি কি আমার কুসুমকে দেখেছ?

কাশেম আমতা আমতা করে, জি দাদিমা...একটা কথা...কুসুম একটু ফুয়াদের সাথে বেড়াইতে গেছে...

গুল নাহার বলেন, ফুয়াদ কে?

কাশেম বলে, পার্কের দারোয়ান?

গুল নাহার বলেন, কোথায় গেছে?

কাশেম বলেন, মনে হয় সিনেমা দেখতে। আমার হাতে এই ফুলটা দিয়া কইল... দাদিমারে কইও আমার আসতে দেরি হইব...উনি যেন চলে যান...

গুল নাহার বলে ওঠেন, আশ্চর্য!

হায়দার বলেন, আজকালকার ছেলেমেয়ে... বলছিলাম না... নিজেদের ব্যাপারে ওরা খুবই পার্টিকুলার।

গুল নাহার বলেন, এখন আমি কী করব? সন্ধ্যা হয়ে আসছে...

কাশেম বলে, মেটিনি শো... ৭টার আগে অরা এখানে আসতে পারত না...

হায়দার বলেন, এক কাজ করি... চলেন আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি...

গুল নাহার বলেন, যাবেন?

হায়দার বলেন, যদি আপনার আপত্তি না থাকে...

না না আপত্তি থাকবে কেন? এতো আমার সৌভাগ্য...

হায়দার বলেন, আর কাশেম মিয়া তুমি এক কাজ করো। তুমি এখানে থাকো। কুসুম ফিরে এলে তুমি কুসুমকে এনাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে তারপর বাসায় ফিরে এসো।

গুল নাহার বলেন, সেই ভালো।

কাশেম বলে, আর যদি কুসুম ফিইরা না আসে?

হায়দার বলেন, সে রকমও হতে পারে নাকি?

কাশেম বলে, আজকালকার পোলাপান, কিছুই কওন যায় না। যে যারে ভালোবাসে, সে তারে বিয়া করে...

হায়দার বলেন, ৭টা পর্যন্ত দেখে তুমি চলে এসো...

কাশেম বলে, আচ্ছা...

৬.

হায়দার আর গুল নাহার ধীরে ধীরে পার্ক থেকে বের হন। কাশেম তাদের জন্যে একটা রিকশা ডেকে দেয়।

দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রিকশায় বসেন।

রিকশা চলতে থাকে।

কেউ কোনো কথা বলেন না।

আকাশে মেঘ গর্জন করে।

হায়দার বলেন, বৃষ্টি হলে খুব ভালো হত।

গুল নাহার বলেন, কেন ভালো হত কেন?

হায়দার মনে মনে বলেন, হুড তুলে দেওয়া যেত। সামনে লাল রঙের পর্দা। আর প্রকাশ্যে বলেন, না মানে বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভালো লাগে কিনা...

আমারও ভালো লাগত। যখন বয়স ছিল। কিন্তু বৃষ্টির পানি আমার একদম সহ্য হতে চায় না। সর্দি কাশি কত সমস্যা।

বয়স হলে এসব আর সহ্য হয় না।

রিকশাঅলা বলে, কোনদিকে যাব স্যার...

হায়দার বলেন, চালাও তো...

গুল নাহার বলেন, শোনো তুমি একটু সংসদ ভবনের সামনে দিয়ে ঘুরে আবার এদিকে এসো।

রিকশা চলছে। বৃষ্টিকে রসিকই বলতে হবে। বৃষ্টি এসে যায়।

হায়দার বলেন, বৃষ্টি এসে যাচ্ছে। হুডটা তুলে দেই।

গুল নাহার বলেন, আপনি না বৃষ্টিতে ভিজতে চাইলেন।

হায়দার বলেন, কিন্তু আপানার শরীর যদি খারাপ হয়... শরীর হলো সবার উপরে।

রিকশাঅলা তোমার পর্দা নাই।

রিকশাঅলা বলে, আছে। সিটের নিচে। নামতে হইব।

তারা দুজন নামেন। রিকশাঅলা পর্দা বের করে। তারা আবার রিকশায় ওঠেন। হুড তুলে দেন। পর্দা ধরে বসে থাকেন। রিকশা চলে।

রিকশাঅলা গান ধরে। *প্রাণবান্ধব রে, বুড়া হইলাম তোরই কারণে...*

তারপর রিকশাঅলা গুল নাহারদের বাড়ির সামনে থামে।

গুল নাহার নেমে যান।

গুল নাহার বলেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

হায়দার বলেন, কেন?

এই যে কষ্ট করে সময় নষ্ট করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন সে জন্যে।

আরে না। কষ্ট কী? ভালোই তো লাগল, একটু রিকশায় চড়ে বেড়ানো হলো, গল্পগুজব করা হলো। ধন্যবাদ বরং আপনারই প্রাপ্য।

আজকে তা হলে আসি।

আচ্ছা। কাল আবার দেখা হচ্ছে, বিকালে, পার্কে।

ইনশাল্লাহ। যদি শরীর ঠিক থাকে।

সেই। এই বয়সে আর কিছুই কি ঠিক থাকে।

আসি।

গুল নাহার চলে যেতে থাকেন। তার হাতের ফুল অর্ধেক ঝরে ঝরে মাটিতে পড়ে যায়।

হায়দার সেদিকে তাকিয়ে বলেন, হায় খোদা আমি কনফার্ম, এই সেই গুল নাহার।

হায়দার রিকশা থেকে নামেন। পড়ে থাকা ফুল কটা কুড়িয়ে নেন। এই সময় তার মনে পড়ে যায় যৌবনের কথা। মানস চোখে ভেসে ওঠে:

একটা পুরনো আমলের বাড়ির ঝুল বারান্দায় তরুণী গুল নাহার দাঁড়িয়ে। সামনে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তরুণ হায়দার। গুল নাহার তার গাড়িতে ফুল ছুড়ে মারছে। আর হায়দার সে ফুল ক্যাচ ধরছেন।

বৃদ্ধা গুল নাহার তার বাড়ির ভেতরে গিয়ে বারান্দায় আসেন। দেখতে পান বৃদ্ধ হায়দার ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি বলেন, এই সেই হায়দার। আমার কোনো সন্দেহ নাই। এই সেই হায়দার... কিন্তু তাকে বলা যাবে না আমি কীভাবে বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম...

আর ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থেকে হায়দার বিড়বিড় করেন, এই সেই গুল নাহার। কিন্তু আমি তাকে বলতে পারি না কীভাবে কাপুরুষের মতো আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম...

হায়দার রিকশায় এসে ওঠেন। রিকশা চলতে থাকে। গুল নাহার তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তখন আবার মেঘ ডাকতে থাকে। বৃষ্টি আসে রিমঝিমিয়ে।

মূল: এ সানি মর্নিং, সেরাফিন ও হোয়াকেন আলবারেত কেনতেরো [Serafin (1873-1938) and Joaquin Alvarez Quintero (1871- 1944)],